নবপর্যায়

শিক্ষা দর্পণ

বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
প্রকাশিত ষাণ্মাসিক পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক : ব্রাত্য বসু

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

জুলাই ২০২৪

বিষয় : ইতিহাস ও সংস্কৃতি

ক্রোড়পত্র : কলকাতা

নবপর্যায়

শিক্ষা দর্পণ

প্রথম বর্ষ। দ্বিতীয় সংখ্যা। জুলাই ২০২৪

বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক

ব্রাত্য বসু

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

স্বাতী গুহ

অমিতাভ দাস

সম্পাদকমণ্ডলী

বিনোদ কুমার, শুভ্র চক্রবর্তী (সদস্য সচিব),
উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ ঘোষ, প্রচেত গুপ্ত,
সুমিত চক্রবর্তী, অভীক মজুমদার, সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Nabaparyay *Shikshadarpan*
(Volume I, Issue II)
A Bi-annual Journal
Published by
The Departments of School and Higher Education
Government of West Bengal

Chief Editor
Bratya Basu

নামাঙ্কন
কৃষ্ণেন্দু চাকী

প্রচ্ছদ
সৌরীশ মিত্র

কপি এডিটিং
রাজীব চক্রবর্তী

[ব্যাক কভারের ছবিটি আন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত]

অরূপ সেনগুপ্ত, মহাধ্যক্ষ, বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বিকাশ ভবন, অষ্টম তল (ইস্ট ব্লক), কলকাতা-৯১ থেকে প্রকাশিত।
দূরভাষ : ০৩৩-৩২৬২ ৪৬৭৮

বিনিময় : ৩০০ টাকা

সূচি

প্রধান সম্পাদকের কলমে

বিষয় ।। **ইতিহাস ও সংস্কৃতি**

সুকান্ত চৌধুরী । বাঙালি জীবনে ইংরেজি ৩

দীপেশ চক্রবর্তী । ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান নাকি গণতন্ত্রেরই
পৃথিবীজোড়া অবক্ষয়? ১৬

মৈত্রীশ ঘটক । আত্মপরিচয় ও ইতিহাস ২৩

রণবীর সমাদ্দার । চিরায়ত বাংলা ৩৩

কুমার রাণা । বিপর্যয়ের কাল ও ক্ষিতিমোহন সেনের শিক্ষা ৪৯

জয়ন্ত সেনগুপ্ত । মহাফেজখানার সংস্কৃতি ৬০

ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী । বই-সংস্কৃতি ৭৩

অনুপ ধর । মন-মননের অ-মৌলায়ন ও প্রাকৃতায়ন ৮০

সংযুক্তা দাশগুপ্ত । ভারতের পূর্বাঞ্চলে আদিবাসী আঞ্চলিক ইতিহাস ৮৭

সাবিহা হক । নারীর আত্মকথন ও একটি দেশের পথ পরিক্রমা :
নূরজাহান বোস-এর *আগুনমুখার মেয়ে* ৯৯

ঋতজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় । কলকাতা চলন্তিকা: ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট
ও সমকালীন সমাজ (১৯১১-১৯৩১) ১১৫

শিমূল সেন । অপরের সংস্কৃতি ১২৭

ক্রোড়পত্র ।। **কলকাতা**

সুগত বসু । সংস্কৃতির ছোঁওয়া, ইতিহাসের ছায়া:
কলকাতায় বড়ো হয়ে ওঠা ১৪১

অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। জলের শহর, কলের শহর
(অলংকরণ : সারনাথ ব্যানার্জি) ১৪৭

সুরঞ্জন দাস । কলকাতার গুন্ডাদের জগৎ: পুলিশ
নথির ভিত্তিতে ফিরে দেখা ১৫৬

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য । কলকাতার রেস্তোরাঁ : কাল, আজ, কাল ১৭০

রন্তিদেব মৈত্র । অন্তরঙ্গ বৈঠক ও জলসার খোঁজে এক যুবক ১৮৩

অরুণ নাগ । পুরোনো কলকাতার দিশি সমাজ ১৯৩

কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত । কলকাতার নেশাড়ু ও পানাড়ু ২০০

স্নেহাশিস সুর। কলকাতায় সাংবাদিকতা : সেকাল থেকে একাল ২৪৫

সুমিত চক্রবর্তী । এলা-দি, বালিগঞ্জ, আর ইন্টেলেকচুয়াল
কলকাতার মেজাজ ২৬১

বরুণ চট্টোপাধ্যায় । কলকাতার গিলে করা হাড় :
একটি পদ্যের বেত্তান্ত ২৭৬

অর্ণব সাহা। উনিশ শতকের কলকাতায় বটতলার বই ২৯৩

পরিচয় পাত্র । কলকাতার ফিল্ম সোসাইটি :
ইতিহাসের অবসান? ৩১২

শুভ্রাংশু রায় । খেলার কলকাতা, কলকাতায় খেলা ৩২০

পিনাকী রায় । কলকাতার বিনোদন ৩৩৭

আত্মপরিচয় ও ইতিহাস

মৈত্রীশ ঘটক

১

ওয়াশিংটন ডিসি-র ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ অ্যাফ্রিকান-অ্যামেরিকান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচারে গিয়েছিলাম সম্প্রতি; চোখ টানল এক হলঘরের দেওয়ালে খোদাই করা জেমস্ বল্ডউইনের একটি উক্তি: ‘‘ইতিহাসের অমোঘ যে টান, তার কারণ হল আমরা তাকে নিজেদের ভিতরে বহন করে চলি, নানানভাবে অচেতনে তা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে, আর আমাদের সমস্ত কাজের ভিতরেই আছে তার অনিবার্য উপস্থিতি’’।

কথাটা আমায় নাড়া দিল, কিন্তু একটা প্রশ্ন মাথার ভিতরে ঘুরপাক খেতেই থাকল : কোন্ ইতিহাস, কার ইতিহাস? ভিতরে ভিতরে আমরা বহুধা ইতিহাস বহন করি—কোন্ ইতিহাস মনে রাখব, কীভাবেই বা তাকে বিশ্লেষণ করব, এসবে কি আমাদের সত্যিই কোনও নিয়ন্ত্রণ আছে?

দাস-জাহাজ থেকে ওয়াইট হাউজ পর্যন্ত অ্যাফ্রিকান-অ্যামেরিকানদের অভাবনীয় ঐতিহাসিক যাত্রার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য এই সংগ্রহশালা। অভিজ্ঞতাটা সুখকর নয়; যন্ত্রণাদায়কও। কিন্তু দাসত্ব, তারপর দাসত্বমোচন হয়ে ১৯৬০-এর নাগরিক অধিকার আন্দোলন পর্যন্ত অ্যাফ্রিকান-অ্যামেরিকানদের যে যাত্রাটা, তা আবার অনুপ্রেরণাও জাগায় বটে। আবার পরবর্তীকালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উত্থান এবং আমেরিকা তথা বিশ্বজুড়ে দক্ষিণপন্থী জনমোহিনী রাজনীতির রমরমা মনে করিয়ে দেয়, সেই যাত্রাপথ ঠিক কতটা দুর্গম, এবং মার্টিন লুথার কিং-এর সেই স্বপ্ন—যেখানে তাঁর সন্তান-সন্ততিকে একদিন গায়ের রং দিয়ে বিচার না-করে শুধুমাত্র

চরিত্র দিয়ে বিচার করা হবে—তা পূরণ হতে এখনও কতটা চড়াই-উৎরাই বাকি আছে।

আমি অ্যামেরিকান নই, যদিও এক দশকেরও বেশি সময় আমি সেখানে পড়াশোনা এবং অধ্যাপনা করেছি। আমি অশ্বেতকায় হলেও অ্যামেরিকায় আমার আত্মপরিচয় দক্ষিণ এশীয় বা ভারতীয়, কৃষ্ণত্ব বা 'ব্ল্যাকনেস' অ্যামেরিকায় যে ঐতিহাসিক এবং সামাজিক যে আত্মপরিচয় বহন করে তা আমার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এই ইতিহাস আমায় ধাক্কা দিয়েছিল। যার কারণ একদিকে স্রেফ গায়ের রঙের উপর ভিত্তি করে একটা গোটা জনগোষ্ঠীর উপর অনাচারের বিষয়টা, আবার তার বিরুদ্ধে সংঘটিত সেই জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক মুক্তিসংগ্রামও (যাতে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে মানুষ যোগ দিয়েছিলেন)। কলকাতায় বাম-উদারপন্থী জলহাওয়ায় বড়ো হয়েছি আমি, মনে আছে, আমার বাবা বসার ঘরে মার্টিন লুথার কিং-এর একটি ফ্রেম-বাঁধানো ছবি টাঙিয়েছিলেন, তাঁর সুবিখ্যাত ''আই হ্যাভ আ ড্রিম'' উক্তি-সহ। স্পষ্টতই, ওয়াশিংটন ডিসি-র ওই সংগ্রহশালা দেখে আমার যে প্রতিক্রিয়া হয়, তার পিছনে সাম্য ও ন্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত যে পরিবেশে আমি বড়ো হয়েছি তার প্রভাব অনেকটাই ছিল।

কিন্তু এই অভিজ্ঞতা আমায় আরও একটা জিনিস নিয়ে ভাবিয়ে তুলেছিল—আত্মপরিচয় ও ইতিহাসের মধ্যে যে সম্পর্কটা। অ্যাফ্রিকান-অ্যামেরিকানদের জন্য দাসত্ব, এবং পরবর্তীকালে বিভাজন এবং বৈষম্যের দীর্ঘ ইতিহাসটি তাঁদের জাতিগত সত্তাটিকে আত্মপরিচয়ের একদম অনিবার্য অঙ্গ করে তুলেছে—কেউ যদি নিজে সেভাবে না-ও দেখতে চান, বাকি সমাজ তাঁকে কিছুতেই ভুলতে দেবে না। তাহলে আমাদের আত্মপরিচয়ই কি একভাবে বেঁধে দিচ্ছে না আমাদের ইতিহাসকে দেখার দৃষ্টিকোণ—বিশেষ করে কার ইতিহাস, কোন ইতিহাসকে আমরা গুরুত্ব দেব, সেই বিষয়টা? প্রশ্নটি শুধু এই ক্ষেত্রে নয়, সর্বত্রই প্রযোজ্য —সমকালীন ভারতের ক্ষেত্রেও। সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি।

২

আইডেন্টিটি অ্যান্ড ভায়োলেন্স: দ্য ইলিউশন অফ ডেস্টিনি (২০০৬) বইয়ে অমর্ত্য সেন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে আত্মপরিচয় সহজাতভাবেই বহুমাত্রিক। আত্মপরিচয়ের এই মূলগত বহুত্ব বা বহুমাত্রিক প্রকৃতির একটি উদাহরণ দিয়ে শুরু করছেন তিনি: 'একজন ব্যক্তি অনায়াসে একইসঙ্গে হতে পারেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে উদ্ভূত মার্কিন নাগরিক, আফ্রিকান পূর্বপুরুষের বংশধর, খ্রিস্টান,

উদারমনস্ক, নারী, নিরামিষাশী, দূরপাল্লার দৌড়ে দক্ষ, ইতিহাসবিদ, স্কুলশিক্ষক, ঔপন্যাসিক, নারীবাদী, বিসমকামী এবং সমকামীদের অধিকারে বিশ্বাসী, নাট্যামোদী, পরিবেশ আন্দোলনকর্মী, টেনিসভক্ত, জ্যাজ সঙ্গীতশিল্পী, এবং এমন একজন যিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে মহাবিশ্বে কোথাও না কোথাও বুদ্ধিমান প্রাণীরা আছে, এবং তাদের সঙ্গে আশু কথোপকথনে যাওয়া প্রয়োজন (আর সেটা ইংরেজি ভাষায় হলেই ভালো)।'

বস্তুতই, ব্যক্তিমানুষের আত্মপরিচয়ের নানান মাত্রা থাকে; যেমন— লিঙ্গ, জাতি, সম্প্রদায়, দেশ, কোথায় বেড়ে উঠেছেন, তাঁর ভাষা, পেশা, পছন্দ-অপছন্দ, আগ্রহের বিষয়, এবং রাজনৈতিক মতামত। সহজ কথায় বললে, আমাদের মধ্যে অনেক 'আমি' থাকে— আমাদের পরিচিতি এই সব পরিচিতিগুলো মিলিয়ে, কোনোটিকে বাদ দিয়ে নয়। সেন বলছেন: 'এই সমস্ত যৌথতা, যাদের মধ্যে এই মানুষটি একইসঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন, তারা সবাই মিলে তাঁর আত্মপরিচয় গড়ে তোলে। এদের কোনওটিকেই তাঁর একমাত্র পরিচয় বলে ধরা বা কোনও একটি যৌথতার সদস্য বলে তাঁকে দাগিয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের আত্মপরিচয় যেহেতু অনিবার্যভাবেই বহুস্তরীয়, তাই কোনো নির্দিষ্ট পরিসরে আমরা আমাদের এই বিভিন্ন ধরনের অনুষঙ্গ ও আত্মতার মধ্যে কোনটিকে আমরা তুলনায় বেশি গুরুত্ব দেব সেটা আমাদের ঠিক করে নিতে হয়।'

তাঁর এই তাত্ত্বিক কাঠামো একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়ে যায়।

প্রথমত, এই বিভিন্ন পরিচয়গুলির মধ্যে কোন্‌টি আমাদের কাছে প্রধান আর কোন্‌টি গৌণ, তার কি কোনও ক্রমবিন্যাস করা সম্ভব? সেটা কীসের ওপরে নির্ভর করবে? খানিকটা সেটা আমরা কোথায় আছি, কার সঙ্গে আছি, এবং কী করছি তার ওপর নির্ভর করবে। বস্তুত , আমরা যদি একা একা একটি দ্বীপে গিয়ে বাস করতাম তবে আমাদের আত্মপরিচয় হয়তো শুধুই নির্ভর করবে আমরা কী করছি তার উপর (যেমন, আমি খাদ্যের সন্ধান করছি, নাকি বই পড়ছি, নাকি সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে স্মৃতিচারণ করছি)। স্কুলের বা কলেজের বন্ধুর সাথে দেখা হলে তখন আমাদের অন্য পরিচিতি ছাপিয়ে সেই যৌথ পরিচিতিই প্রাধান্য পায়। আবার বিদেশে আমরা ভারতীয় সেই পরিচিতি অনেক সময় প্রাধান্য পায়, কারণ দেশের মধ্যে সেই পরিচয় তো সবারই, তাই টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখার সময় বা বিদেশনীতি আলোচনার সময় ছাড়া তার খুব একটা তাৎপর্য থাকে না। কিন্তু তাহলেও, আরেকটু তলিয়ে ভাবলে আমাদের

ব্যক্তিপরিচয়ের যে প্রধান মাত্রাগুলো সেগুলোর নির্ধারণে কোন্ কোন্ উপাদানের ভূমিকা বেশি, তার কিন্তু সহজ উত্তর নেই।

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি মানুষের আত্মপরিচয়ের যদি এতগুলি আলাদা আলাদা মাত্রা থেকে থাকে, তবে এমন একটা সাধারণ জায়গা কোথায় যেখানে সবাই সবার সঙ্গে আলাপে যেতে পারে? আমরা যখন কথা বলছি, তখন কোন্ 'আমি' কথা বলছে কোন্ 'আপনি'-র সঙ্গে? সেখানে একটা পন্থা হল সমন্বয়ী : আমাদের মধ্যে কোন্ সত্তাগুলো এক, তাতে মনোযোগ দেওয়া। আবার অন্য একটা পন্থা হল ভিন্নতাপন্থী : আমাদের মধ্যে ফারাক কিসে কিসে, সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া (তা স্বাচ্ছল্য হতে পারে, ভাষা হতে পারে, ধর্ম হতে পারে আবার কবিতা ভালো লাগে কিনা তা নিয়ে হতে পারে)। প্রথমটির ক্ষেত্রে কথা গড়াবে অনেকদূর আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খুব একটা না। ভিন্নতাপন্থী মানেই যে খারাপ তা নয়— অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও নিজেকে আলাদা রাখা যেতেই পারে (এখানে 'নির্জনতম' কবি জীবনানন্দ দাশের উদাহরণ ভাবা যেতে পারে)। সমস্যার শুরু তখনই যখন আমাদের অন্য সব পরিচিতিগুলোকে ছাপিয়ে একটিকেই প্রাধান্য পায়, সে আমরা চাই বা না চাই (যেমন, অমর্ত্য সেনের এই উদাহরণের মানুষটির নারীত্ব বা কৃষ্ণত্ব বা খ্রিস্টানত্ব)। এখানে ক্ষমতার অসাম্যের একটা বড়ো ভূমিকা আছে আর তাই ভিন্নতাপন্থী পরিচয়ের রাজনীতির একটা সদর্থক ভূমিকাও আছে — বিভিন্ন দেশে ও কালে প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষজনকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার দিতে সক্ষম হয়েছে, যার মধ্যে অ্যামেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের বা আমাদের দেশে দলিতদের বা নারীদের সমান অধিকারের সংগ্রাম পড়ে।

তৃতীয়ত, মানুষ কোন্ ধরনের ইতিহাসের সঙ্গে একাত্ম বোধ করবে, ঐতিহ্য হিসেবে ধারণ করবে তাহলে? একজন আফ্রিকান-অ্যামেরিকান মানুষ কি শুধু তাঁর মার্কিন নাগরিকত্বের ইতিহাসকেই মাথায় রাখবেন, নাকি ধারণ করবেন দাসত্ব, বিভাজন এবং নাগরিক অধিকার আন্দোলনের ইতিহাসটিকে? দুটোই সম্ভবত, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন্ ইতিহাসটি তাঁর কাছে মুখ্য? যদি-বা তাঁরা সেই 'সার্বিক' মার্কিনি ইতিহাসকেই বহন করতে চান, তবুও কি তাঁর জাতিসত্তা, এবং এককালে যে তাঁর মতো মানুষদের সমান চোখে দেখা হত না সেই বিষয়গুলি তাঁর ইতিহাসচেতনাকে প্রভাবিত করবে না?

এইরকম প্রশ্ন আমাদের যে কাউকে করা যেতে পারে: যেমন— এই আমি, কলকাতা ও বহরমপুরে বড়ো হয়েছি, উচ্চশিক্ষার জন্য দিল্লিতে থেকেছি কিছুকাল, ডক্টরেটের পড়াশোনা এবং আমার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিসূত্রে এক দশকের

উপর কাটিয়েছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এবং এখন লন্ডনে থাকি দুই দশকের বেশি— আমার ব্যক্তিগত ইতিহাস তথা যেসব অঞ্চলে ও দেশে আমি থেকেছি তাদের ইতিহাসের কোন্ কোন্ সূত্রগুলিকে আমি সচেতনভাবে মুখ্য বলে ধরব? আমি কি সেইসব প্রবাসী অশ্বেতাঙ্গ মানুষদের কথাও ভাবব যাঁরা এমন সব দেশে থেকেছেন, পড়াশোনা ও কাজকর্ম করেছেন যেখানে তাঁরা সংখ্যালঘু— ঠিক আমারই মতো? আমি অর্থনীতিবিদ, কাজেই আমার বিদ্যাচর্চার ধারাটির ইতিহাস এবং সেই ধারায় আমার কাজ যে বিন্দুতে পড়ে— সেটাও কি আমার ইতিহাস, আমার ঐতিহ্যের অঙ্গ?

৩

আমার মনে হয়, ইতিহাস এবং আমাদের আত্মতা পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, এবং ইতিহাসের বিভিন্ন সংস্করণ ও মাত্রাগুলির সঙ্গে আত্মপরিচয়ের বিভিন্ন সংস্করণ ও মাত্রাগুলির মধ্যে নানা বিচিত্রভাবে আদান-প্রদান ঘটে থাকে। এই প্রভাব বিস্তারের চরিত্র উভমুখী— আত্মপরিচয় ইতিহাসকে প্রভাবিত করে, আবার ইতিহাসও প্রভাবিত করে আত্মপরিচয়কে।

আমাদের আত্মপরিচয় কী রূপ নেবে তা নির্ভর করে আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ইতিহাস, তথা যেসব বৃহত্তর গোষ্ঠীতে আমরা নিজেদের সম্পৃক্ত বলে মনে করি তাদের ইতিহাসের উপরেও। এই গোষ্ঠীগুলি স্থানীয় হতে পারে, আঞ্চলিক বা জাতীয় হতে পারে, আন্তর্জাতিকও হতে পারে। একইভাবে, এই একাত্মতা ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সীমারেখা ছাড়িয়ে ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, জাতিগত, বর্ণগত, লিঙ্গগত, সামাজিক, কিংবা অর্থনৈতিক পরিচয়ের যোগসূত্রেও গাঁথা হয়ে থাকতে পারে। যদি আর একটু গভীরে গিয়ে দেখা যায়, এই একাত্মতার ভিত্তি হতে পারে আমাদের পেশাগত পরিচয়, শিক্ষাগত স্তর, যেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমরা সংযুক্ত, আমাদের রাজনৈতিক বা মতাদর্শগত ঝোঁক, সাংস্কৃতিক রুচি, আমাদের পছন্দ-অপছন্দ, ভালো লাগার কাজও।

হ্যাঁ, আত্মপরিচয় মূলগতভাবে বহুস্তরীয়ই, কিন্তু তা অমোঘ ভাগ্যলিখন নয়— এখানে আমাদের নির্বাচনের একটা স্বাধীনতা নিশ্চিতভাবেই আছে, যদিও তা সব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়— তার মাত্রা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। আমাদের কোন্ নির্বাচন তবে এই বহুবর্ণ আত্মতাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখেও পরস্পরের সঙ্গে সমস্তরীয় একটা সংলাপের জায়গায় নিয়ে আসতে পারঙ্গম? এর কোনও সহজ উত্তর নেই।

আমাদের মধ্যে যা-কিছু একরকম তার স্বীকৃতি দিয়েই শুরুটা হওয়া দরকার, কিন্তু যে আলাদা আলাদা ইতিহাসগুলি আমাদের অনন্য করে তোলে, তাদের যথাযথ মর্যাদা ও স্থান দেওয়াটাও প্রয়োজন। রাজনীতিতে, অথচ, বিশ্বজনীনতার দৃষ্টিকোণটি একেবারেই বিরল। এমনকি ভূতপূর্ব সমাজবাদী বা কমিউনিস্ট দলগুলি, বা বর্তমানকালের বাম-ঘেঁষা রাজনৈতিক দল যাদের সাংগঠনিক ভিত্তিই হল সর্বজনীনতা—তারাও প্রায়শই বিদেশনীতি বা অভিবাসনের মতো বিষয়গুলিতে জাতীয়তাবাদী বা ধর্মীয় পরিচয়ভিত্তিক অবস্থান নিয়ে থাকে (উদাহরণ: লেবার পার্টির একাংশের তরফে ব্রেক্সিটের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ)। তবে এর বিপরীত অভিমুখের উদাহরণও আছে: অ্যাফ্রিকান-অ্যামেরিকানদের সংগ্রামের বিষয়টিতে ফিরে গেলে, ম্যালকম এক্স প্রাথমিকভাবে নাগরিক অধিকার আন্দোলনে অ-কৃষ্ণাঙ্গদের যোগ দিতে না দেওয়ার সংকীর্ণ অবস্থান রাখলেও, ধীরে ধীরে এ বিষয়ে অনেক বেশি উদারমনস্ক হয়ে উঠেছিলেন।

উপরন্তু, আমাদের আত্মপরিচয় পাথরে খোদাই করা নয়। আমাদের জীবন তথা ব্যক্তিগত ও যৌথ ইতিহাসগুলি যেহেতু মূলগতভাবেই বহুস্তরীয়, তাই জীবনের নানা পর্যায়ে আমাদের আত্মপরিচয়ের আলাদা আলাদা দিক তুলনায় বেশি বা কম গুরুত্ব পাবে, এবং সেইমতো আমাদের আত্মপরিচয় বিকশিত হতে থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক (কখনো কখনো তা সম্পূর্ণ বদলেও যেতে পারে, ধরুন যখন কারও রাজনৈতিক মতাদর্শ পালটে যায়, কেউ ধর্মান্তরিত হন, বা অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন)। এই সমস্ত আলাদা আলাদা পরিচয়গুলি আমাদের মননে একই সঙ্গে বাস করে, এবং নানান মুহূর্তে নানান ধরনের পরিচয় আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নানারকমের অভিঘাতে — কোনও ঘটনা, কোনও নির্দিষ্ট মানুষের সঙ্গে কথোপকথন, আমরা সেই মুহূর্তে কোথায় আছি, নির্দিষ্ট কোনও অভিজ্ঞতার প্রভাবে উঠে আসা নির্দিষ্ট কোনও স্মৃতি, আর কখনো কখনো, স্রেফ সমাপতনে।

৪

আমি বলব, আত্মপরিচয়ের এই বহুস্তরীয় চরিত্র নিহিতভাবেই এই আলাদা আলাদা ইতিহাসগুলির বহুস্তরীয় চরিত্রের সঙ্গে বাঁধা পড়ে আছে। এইসব ইতিহাসগুলি থেকে কয়েকটি নির্দিষ্ট বয়ান ছেঁকে তুলে নিলে আমাদের একধরনের পরিচয়কে অন্য পরিচয়গুলির উপরে রাখা হয়ে যায়, এবং একইভাবে, কোনও একটি পরিচয়ের সঙ্গে অতিরিক্ত একাত্মতা আমাদের ইতিহাসকে দেখার একটা অত্যন্ত একপেশে দৃষ্টিকোণের দিকে ঠেলে দেয়।

দার্শনিক জর্জ সান্তায়ানা যেমন বলেছেন, যারা অতীত মনে রাখতে পারে না, তাদের অভিশাপ হল অতীতের পুনরাবৃত্তি করা। আমাদের পটভূমিতে এই বাক্যকে ফেলে দেখলে বলা যায় : যারা ইতিহাস ভুলে যায় তাদের অভিশাপ হল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা। আবার এটাও বলা যায়, অতীতেই আটকে আছে যারা, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির অভিশাপ লেগে আছে তাদের মাথাতেও। ইতিহাসের ছাঁটকাট করে তৈরি করা একটা সংস্করণে যদি 'বিদেশি' হানাদারদের আক্রমণে আমাদের 'আসল' সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে এমন একটা বয়ান তুলে ধরা হয়, তবে যাদের ইতিহাস সেই 'হানাদারদের' সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বেশি সম্পৃক্ত, তাদের নিজেদের লোক ভাবতে আমাদের অসুবিধা হয় বেশি। আত্মপরিচয়কে এভাবে সংকীর্ণ করে দেওয়ার মাধ্যমে ইতিহাসের একটা খণ্ডিত এবং প্রায়শই ক্ষতিকারক পাঠ তৈরি হয়— যেখানে কোনও এক গোষ্ঠী সর্বদেশে-সর্বকালে অন্যদের হাতে শোষিত হয়েছে বলে দাগিয়ে দেওয়া যায়— এবং তা আত্মপরিচয়ের এই সংকীর্ণতাকেই আরও জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

তবুও, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রখ্যাত কবিতা 'হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে'-র সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি দেখি ('হেথায় আর্য, হেথা অনার্য/হেথায় দ্রাবিড়, চীন—/ শক-হুন-দল পাঠান মোগল/এক দেহে হল লীন।/পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,/সেথা হতে সবে আনে উপহার,/দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে / যাবে না ফিরে,/এই ভারতের মহামানবের/ সাগরতীরে'), তবে দেখতে পাব যে মানবসত্তার নানান ধারার নানান ইতিহাসের সম্মেলনে যে সর্বজনীন আত্মপরিচয়ের সৃষ্টি হচ্ছে তা তার খণ্ডগুলির যোগফলের থেকে অনেক, অনেক বড়ো; যেখানে আলাদা আলাদা মানবগোষ্ঠী তাদের ভিন্নতা সত্ত্বেও এক বিরাট বহমান ধারার অংশ হিসেবে পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে।

এই দৃষ্টিকোণ আমাদের মনে পড়াবে, আমাদের ইতিহাসে এমন বহু পর্যায় আছে যেখানে এই আলাদা আলাদা সংস্কৃতিগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে ভারতীয়ত্বের এমন একটা ধারণা তৈরি করেছে যা অনন্য— যা কোনও একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী থেকে সরাসরি উদ্ভূত বলে কোনওমতেই ধরা যায় না।

গত দশ বছরে ভারতের ইতিহাসের সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একদম সাম্প্রতিক একটা ধরা যাক। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধীকে ভর্ৎসনা করেছেন মধ্যযুগে মুঘলরা

হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার করেছিল তা মনে না রাখার জন্য। এখন ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ গজনি যখন সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করে নির্বিচার লুঠতরাজ এবং হত্যালীলা চালিয়েছিল, বা যখন মুঘলরা এইধরনের অত্যাচার করেছিল, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে এই অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার এক হাজার বছর পরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ তার জন্যে দায়ী হবে কেন? কেন প্রতি মুহূর্তে তাঁদের ভারতীয়ত্বের পরীক্ষা দিতে হবে এবং যেকোনো মুহূর্তে তাঁদের ওপর হামলা হতে পারে সেই আশঙ্কায় থাকতে হবে?

এইভাবে কেটেছেঁটে ইতিহাস পাঠ করা এবং আত্মপরিচয়কে সংকীর্ণ একটা জায়গায় নামিয়ে আনলে আমাদের মনন একটা নিম্নগামী ঘূর্ণির মধ্যে আটকে পড়ে যায়। বেছে বেছে শুধু নিজেদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অন্যায় খুঁজে বের করে, তারপর একটা নির্দিষ্ট পরিচয়ের মধ্যে নিজের সবটুকু আত্মতাকে ভরে দিয়ে, সেই পরিচয়ের বাইরে থাকা সমস্ত 'অপর'কে অস্বস্তিকর এবং বিপজ্জনক হিসেবে দেখার অভ্যাস গেড়ে বসে।

৫

আসলে এই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক আত্মপরিচয়গুলি এক-একটা দুষ্টচক্র; এদের প্রসূত সংঘাত তৈরি করে হিংসা এবং অন্যায়ের আরও নতুন নতুন ইতিহাস, আরও জমাট হয় সাম্প্রদায়িক আত্মতার বিষ। আর দুষ্টচক্রের সবথেকে বড়ো সমস্যা হল, এর থেকে বেরোতে হলে একটা বিরাট জোরের ধাক্কা দরকার যা এই পুরো বয়ানটাকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা গতিপথে নিয়ে যেতে পারবে।

এই দুষ্টচক্রের ধারণাটা আরেকটু তলিয়ে ভাবা যাক। দুটি প্রবণতা যদি পরস্পরকে বাড়িয়ে দিতে থাকে তাহলে গোটা প্রক্রিয়াটার মাঝামাঝি থিতানোর কোনো সম্ভাবনা নেই, হয় সবনিম্ন নয়তো সর্বোচ্চ মাত্রায় গিয়ে থামবে, অর্থাৎ ভারসাম্য পাবে। অর্থবিদ্যায় দুষ্টচক্রের ধ্রুপদী উদাহরণ দারিদ্র্য নিয়ে—দারিদ্র্য যত বাড়বে আয়ের সবটাই ব্যয় হয়ে যাবার প্রবণতাও যদি বাড়ে তাহলে আস্তে আস্তে সঞ্চয় করে দারিদ্র্যমুক্তির সম্ভাবনা তত কমবে— তাই অতিদরিদ্র ও সম্পন্ন এই দুই শ্রেণির মানুষের প্রাধান্য দেখা যাবে। সেরকম সংকীর্ণ আত্মপরিচয় এবং তাকে সমর্থন করে এমন ইতিহাসচর্চার পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে এর থেকে বেরোবার পথও বন্ধ হতে থাকবে।

এখানে দুটি প্রক্রিয়া কাজ করছে। একটা হল যাকে মনোবিজ্ঞানে বলে কনফার্মেশন বায়াস বা একপেশে যাচাই করার প্রবণতা— আমাদের বিশ্বাসের স্বপক্ষে তথ্যপ্রমাণ আমাদের বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। আর অন্যটি হল, সমমনস্ক

লোকের সাথে মেলামেশা করার প্রবণতা, যার ফলে আমাদের মতামতগুলো একটা প্রতিধ্বনিকক্ষে আটক পড়ে যায়। ফলে, সামাজিকস্তরে মতামত ও বিশ্বাসের একটা মেরুকরণ হয়ে যায় এবং দুই পক্ষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটা অবিশ্বাস এবং সহানুভূতিহীন মনোভাব গড়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে যতুটুকু মেলামেশা হয় তাতে এই পারস্পরিক বীতরাগ বাড়তেই থাকে।

এবার ভেবে দেখুন কোনো চিন্তাশীল এবং বিবেকবান মানুষের কথা যিনি কোনো কারণে নিজস্ব চিন্তার জগতে এই আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। তিনি যদি খোলাখুলিভাবে নিজের মতপ্রকাশ করেন, তাহলে উভয়-সংকটে পড়তে পারেন। আপাতভাবে নিজের পক্ষের কোনো কথা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তখন তাঁকে তকমা দেওয়া হবে 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' বা 'দেশদ্রোহী' বা 'ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী'। আবার পুরোপুরি অন্যপক্ষের সব বক্তব্যের সাথে সহমত না হলে তিনি আপাতদৃষ্টিতে যে গোষ্ঠীর মধ্যে পড়েন, সেই পরিচয়ের দিকে আঙুল তোলা হবে, বলা হবে উনি তো বলবেনই, আসলে তো তলে তলে গোষ্ঠী-আনুগত্য থেকে বেরোতে পারেননি। মানুষমাত্রেই সামাজিক জীব, তাই তাঁর প্রবণতা হবে চুপ করে যাওয়া বা বিতর্কে না-জড়ানো।

তাই শেষ পর্যন্ত যে মতামতগুলো সবচেয়ে জোরের সাথে শোনা যাবে, সেগুলো সত্যিই চরমপন্থী হবে, কারণ তাঁদের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সমস্যা নেই। এবং এটা যত হবে ততই মধ্যপন্থী কণ্ঠগুলো আরও চুপ হয়ে যাবে। এখানেও একটা দুষ্টচক্র কাজ করছে যার ফল হবে মতামতের মেরুকরণ। তাতে ক্ষতি হল, যদি সবাই খোলাখুলি আলোচনা করতেন তাহলে অনেকে হয়তো তাঁদের মত খানিকটা পাল্টাতেন এবং এই আদান-প্রদানে হয়তো একটা সহিষ্ণুতর সামাজিক বাতাবরণ তৈরি হতে পারত, সেই সম্ভাবনা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, আপনার বিশ্বাস যাই হোক-না কেন, বিভিন্ন মতামত শুনলে নিজের বোঝার জায়গাটা অনেক মজবুত হতে পারত, সেটার সম্ভাবনাও কমে আসবে।

এই ধরনের মেরুকরণ শুধু ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা নয়, যে-কোনও মতাদর্শগত বিষয়ে হতে পারে। যেমন ধরুন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় সংকটের পেছনে কী কারণ ছিল সেই আলোচনায় অর্থনৈতিক পরিসরে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের সমস্যার কথা বললেই যদি আপনাকে নয়া-উদারবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী বলে সমালোচনা শোনার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে আপনি চুপ করেই থাকবেন কিন্তু এর ফলে ক্ষতি হবে যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা বন্ধ হয়ে যাবে এবং যাঁরা তা

সত্ত্বেও মতপ্রকাশ করবেন তাঁদের মত সত্যিই খানিকটা উগ্র বাম নয়তো উগ্র দক্ষিণপন্থী হবে।

এই মেরুকরণের সাথে আত্মপরিচিতির সংকীর্ণতা এবং ইতিহাসের একপেশে আখ্যানে আবদ্ধ থাকার প্রবণতাগুলো যোগ করলে, দুষ্টচক্রের ছবিটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। কিন্তু এইভাবে দেখলে এটাও বোঝা যায় যে বিকল্প একটা ভারসাম্যবিন্দুও সম্ভব, যেখানে আমরা নিজস্ব সংকীর্ণ আত্মপরিচিতির ঊর্ধ্বে উঠে অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাস এবং বর্তমান জগৎকে দেখতে চেষ্টা করি। তাতেও কিছু মানুষ হয়তো চরম মত পোষণ করবেন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ হয়তো আরও প্রসারিত আত্মপরিচিতি এবং ইতিহাসের বহুত্ববাদী আখ্যান গ্রহণ করবেন।

৬

ইতিহাস আমাদের সবার উপরেই ছাপ রেখে যায়। কিন্তু তার ফাঁদে আটকে পড়লে বিপদ। ইতিহাস এবং আমাদের আত্মপরিচয়— উভয়েরই যে বহুস্তরীয় চরিত্র, তা মাথায় রাখলে তবেই সম্পূর্ণ অজ্ঞতা এবং গভীর অথচ সংকীর্ণ সচেতনতার দ্বৈত ফাঁদ এড়াতে সক্ষম হব আমরা।

কীভাবে এটা করা সম্ভব তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। হয়তো সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহতা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলে একটা আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া শুরু হবে। হয়তো একটা চরম বিপর্যয় লাগবে এই দুষ্টচক্র ভাঙতে। হয়তো এটা একটা দীর্ঘমেয়াদি কাজ, যার শুরু হওয়া দরকার শিশুদের আমরা যে ইতিহাস শেখাচ্ছি তার মধ্যে দিয়ে একটা সর্বজনীন ইতিহাস ও আত্মতার বোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে, তিরিশ ও চল্লিশের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ এবং প্রগতিশীল লেখক আন্দোলন যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছিল, খানিকটা সেই ধাঁচে। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক দক্ষিণপন্থা বহুবছর ধরে ভারতে এবং বিশ্বের অন্যত্র যে কাজটা করে চলেছে, তার থেকে খুব কিছু আলাদা নয় এই কাজটা। এর মূল নির্যাস বিখ্যাত একটি কবিতার বহুল-উদ্ধৃত একটি পঙ্‌ক্তিকে সামান্য বদলে বলা যেতে পারে : ‘যেথা পরিচয়ের প্রাচীর/ আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী/বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি’।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার: লেখাটির প্রাথমিক খসড়া পড়ে মনীষিতা দাশ ও প্রতীচী প্রিয়ংবদা মন্তব্য করেছেন এবং দ্যুতি মুখোপাধ্যায় লেখাটির প্রস্তুতিতে সাহায্য করেছেন। সেমন্তী ঘোষের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। এঁদের সাহায্য কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি, যদিও বক্তব্যের দায় সম্পূর্ণ আমার।]